।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দোষদৃষ্টিমুক্ত হয়ে যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক আমার মতে চলবেন; তিনি সকল কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবেন। যোগই (জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ) আমাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই যোগেই যুদ্ধসঞ্চার নিহিত। প্রস্তুত অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে এই যোগের আবিষ্কারক কে? কিভাবে এর ক্রমিক বিকাশ হয়?

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

অর্জুন! আমি এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে বিবস্বান্ (সূর্য) কে বলেছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। কে বলেছিলেন? আমি। শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন? যোগী। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষই এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে অর্থাৎ ভজনের আরম্ভে বিবস্বান্ অর্থাৎ যে নিশ্চেষ্ট, এরূপ প্রাণীর প্রতি বলেন। শ্বাসে সঞ্চার করে দেন। এই স্থানে সূর্য প্রতীকস্বরূপ, কারণ শ্বাসেই ঐ পরমপ্রকাশস্বরূপ বিদ্যমান এবং ঐরূপেই তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করা বিধেয়। বাস্তবিক প্রকাশদাতা (সূর্য) সেস্থানেই আছে।

এই যোগ অবিনাশী। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এর আরম্ভের নাশ নেই। এই যোগ একবার আরম্ভ করে দিলে পূর্ণত্ব প্রদান করেই শান্ত হয়। দেহের কল্প ঔষধির দ্বারা হয়, কিন্তু ভজনের দ্বারা আত্মার কল্প হয়। ভজনের আরম্ভই আত্মকল্পের আদি। এই সাধন-ভজনও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলেই করা সম্ভব হয়। মোহনিশায় অচেতন আদিম মানব, যাদের মধ্যে ভজনের সংস্কার নেই, যোগবিষয়ে যারা কোনদিন চিন্তন

করেনি, এ ধরনের মানুষও মহাপুরুষের দর্শন মাত্র, তাঁর বাণী শুনে, কিছু সেবা-সান্নিধ্য করলে যোগের সংস্কার তাদের মধ্যেও সঞ্চার হয়। একেই গোস্বামী তুলসীদাসজী বলেছেন- **'জে চিতয়ে প্রভু জিন্হ প্রভু হেরে।', 'তে সব ভয়ে পরমপদ জোগু।' (রামচরিতমানস, ২/২১৬/১-২)।**

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই যোগ আমি আরম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম। **'চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।'** মহাপুরুষের দৃষ্টি-নিক্ষেপ মাত্রই এই যোগের সংস্কার শ্বাসে সঞ্চার হয়। সকলের হৃদয়ে স্বয়ংপ্রকাশ, স্ববশ পরমেশ্বরের নিবাস স্থান। শ্বাস নিরোধের দ্বারাই এর প্রাপ্তির বিধান। শ্বাসে সংস্কারের সৃজনই হ'ল সূর্যের প্রতি বলা। সময় হলে এই সংস্কারের স্ফুরণ মনে হয়, মনুর প্রতি এই হ'ল সূর্যের বক্তব্য। মনে স্ফুরণ হলে মহাপুরুষের বাক্যের প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মনে কোন লালসার স্ফুরণ হলে তা লাভ করবার ইচ্ছাও অবশ্যই হয়, মনু ইক্ষ্বাকুকে তাই বলেছিলেন। লালসা জাগবে যে, সেই নিয়ত কর্ম করি, যা অবিনাশী, যা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেবে– যদি এমনই হয়, তাহলে করা যাক্ এবং এইভাবে আরাধনাতে তীব্রতা এসে যায়। এই যোগে তন্ময়তা, কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

এইরূপ কোন মহাপুরুষদ্বারা সংস্কাররহিত পুরুষের শ্বাসে, শ্বাস থেকে মনে, মন থেকে ইচ্ছায় এবং ইচ্ছা প্রবল রূপ ধারণ করে ক্রিয়াত্মক আচরণের মধ্য দিয়ে এই যোগ ক্রমশঃ উত্থান করতে করতে রাজর্ষি স্তরে পৌঁছোয়, সেই অবস্থায় গিয়েই প্রকাশমান হয়। এই স্তরের সাধকের মধ্যে ঋদ্ধি-সিদ্ধাই-এর সঞ্চার হয়। সেই যোগ এই মহত্বপূর্ণকালে এই লোকেই (দেহেই) প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। এই সীমারেখা কিভাবে পার করা যায়? তাহলে কি এই বিশেষ স্তরে পৌঁছে সকলেই নষ্ট হয়ে যায়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন– না, যিনি আমার আশ্রিত, আমার প্রিয় ভক্ত, অনন্য সখা তিনি নষ্ট হন না।

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।। ৩।।

এই পুরাতন যোগ-সম্বন্ধে এখন আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগ উত্তম ও রহস্যপূর্ণ। অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন, রাজর্ষি স্তরের ছিলেন, যেখানে ঋদ্ধি-সিদ্ধিই-এর লোভে পড়ে সাধক নষ্ট হয়ে যায়। এই স্তরেও যোগ কল্যাণের মুদ্রাতেই থাকে; কিন্তু প্রায়ই সাধক এখানে এসে স্খলিত হয়ে যায়। এরূপ অবিনাশী কিন্তু রহস্যময় যোগ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন; কারণ অর্জুন নষ্ট হবার অবস্থায় ছিলেন। কেন বললেন? এই জন্য যে তুমি আমার ভক্ত, অনন্যভাবে আমার আশ্রিত, প্রিয় এবং সখা।

প্রস্তুত অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান বলেছেন যে, এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে আমিই সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্যের নিকট মনু এই গীতা লাভ করেছিলেন এবং নিজের স্মৃতি ভাণ্ডারে সুরক্ষিত করেছিলেন। মনুর নিকট এই স্মৃতি ইক্ষ্বাকু লাভ করেছিলেন এবং পরে রাজর্ষিগণ তাঁর কাছে থেকে এ বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এই মহত্ত্বপূর্ণ কালে সেই যোগ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই পুরাতন স্মৃতিজ্ঞান-সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন। মনু জ্ঞানের যে সারতত্ত্ব লাভ করেছিলেন, সেটা এই গীতাশাস্ত্র। মনু এটাই বংশপরম্পরায় লাভ করেছিলেন। এর অতিরিক্ত আর কোন স্মৃতি তিনি ধারণ করতেন। গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জুন বলেছেন যে, "আমি জ্ঞান লাভ করেছি", যেরূপ মনু লাভ করেছিলেন। অতএব শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি।

যে পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক আমরা, সেই (সদ্‌গুরু) পরমাত্মা যখন আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে নির্দেশ দেবেন, তখনই যথার্থ ভজন আরম্ভ হবে। এখানে প্রেরকের স্থানে পরমাত্মা এবং সদ্‌গুরু একে অন্যের পর্যায়। যে স্তরে সাধক দাঁড়িয়ে, সেই স্তরে যখন প্রভু স্বয়ং নেমে আসেন, আদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন, দিক্‌ভ্রান্ত হলে রক্ষা করেন, তখনই মন বশে হয়- **"মন বশ হোই তবহিঁ, জব প্রেরক প্রভু বরজে।" (বিনয়পত্রিকা, ৮৯)** ইষ্টদেব আত্মা থেকে রথী হয়ে, অভিন্ন হয়ে প্রেরকরূপে প্রেরণা প্রদান না করলে, এই পথে ঠিক-ঠিক প্রবেশ হয় না। সেই সাধক প্রত্যাশী অবশ্যই, কিন্তু তার কাছে ভজন কোথায়?

পূজ্য গুরুদেব ভগবান বলতেন- "হো! আমি কয়েকবারই পথভ্রষ্ট হতে হতে বেঁচে গেছি। ভগবানই বাঁচিয়েছেন। ভগবান এইভাবে বুঝিয়েছেন, এই বলেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম- "মহারাজজী! ভগবানও কথা-বার্তা বলেন?"

বললেন– "হ্যাঁ হো! ভগবানও এমনিই কথা বলেন, যেমন আমি-তুমি বলে থাকি, ঘন্টার পর ঘন্টা বার্তালাপ চলে, কিন্তু ক্রমভঙ্গ হয় না।" আমি ম্রিয়মান হয়েছিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যেও পড়েছিলাম যে, ভগবান কথা বলেন, এটাতো বড় নতুন কথা। কিছুক্ষণ পরে মহারাজজী বলেছিলেন- "কেন মন অধীর করছ, তোমার সঙ্গেও বলবেন।" সত্য ছিল তাঁর বক্তব্য এবং এটাই সখ্যভাব। সখার মত তিনি নিরাকরণ করেন, তাহলেই এই দুরবস্থা সাধক উত্তীর্ণ করতে পারে।

এপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষদ্বারা যোগের আরম্ভ, যোগপথে বাধা এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হবার পথসম্বন্ধে বললেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন প্রশ্ন করলেন-

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।। ৪।।

ভগবন্! আপনার জন্ম **'অপরম্'**- এখন হয়েছে এবং আমার মধ্যে শ্বাসের সঞ্চার বহু আগে হয়েছিল। এই যোগসম্বন্ধে ভজনের আদিতে আপনিই বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। ৫।।

অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম-এর পূর্বেও হয়েছে। হে পরন্তপ! আমি সেই সকল জানি, কিন্তু তুমি তা জান না। সাধক জানে না, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ জানেন। যিনি অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, তিনি জানেন। তাহলে কি আপনি আর সকলের মত জন্ম গ্রহণ করেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন– না, স্বরূপলাভ এবং দেহলাভ এক নয়। আমার জন্ম এই চোখে দেখা সম্ভব নয়। আমি অজন্মা, অব্যক্ত, শাশ্বত হয়েও এখন দেহের আধারযুক্ত।

অবধু, জীবত মেঁ কর আসা।

মুএ মুক্তি গুরু কহে স্বার্থী, ঝুঠা দে বিশ্বাসা।।

দেহ থাকতেই সেই পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভ সম্ভব। লেশমাত্র ত্রুটি থাকলে, জন্মগ্রহণ করতে হয়। অর্জুন এখনও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মতই দেহধারী বলে মনে করছেন। তিনি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করলেন– আপনার জন্ম কি অন্য সকলের মতই হয়েছে ? আপনিও কি দেহগুলি যেভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬।।

আমি বিনাশরহিত, পুনর্জন্মরহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রাণবায়ুতে সঞ্চারিত হয়েও স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে আত্মমায়াদ্বারা আবির্ভূত হই। একটি মায়া অবিদ্যা, যা প্রকৃতিতে বিশ্বাস এনে দেয়, নীচ এবং অধমযোনির কারণ। অন্যটি মায়া আত্মমায়া, যা আত্মতত্ত্বকে জানবার সুযোগ এনে দেয়, স্বরূপকে জন্ম দেয়। একেই যোগমায়াও বলে। যার থেকে আমরা পৃথক ঐ শাশ্বত স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করে, মিলন করিয়ে দেয়। সেই আত্মিক প্রক্রিয়াদ্বারা আমি স্বীয় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে আবির্ভূত হই।

প্রায়ই লোকে বলে যে, ভগবানের অবতার হবে, তখন দর্শন করব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, এমন কিছু হয় না যে অন্য কেউ দেখতে পাবে। স্বরূপের জন্ম পিণ্ডরূপে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যোগসাধনাদ্বারা, আত্মমায়াদ্বারা নিজের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে স্ব-বশ করে আমি ক্রমশ আবির্ভূত হই। কিন্তু কোন্-কোন্ পরিস্থিতিতে ?–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৭।।

হে অর্জুন ! যখন যখন পরমধর্ম পরমাত্মার জন্য হৃদয় গ্লানিতে ভরে যায়, যখন অধর্মের বৃদ্ধিতে অনুরাগী উদ্ধারের পথ দেখতে পায় না, তখন আমি আত্মস্বরূপের রচনা করি। এরূপ গ্লানিই মনুর হয়েছিল–

হৃদয় বহুত দুখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।

(রামচরিতমানস, ১/১৪২)

যখন আপনার হৃদয় অনুরাগে ভরে ওঠে, ঐ শাশ্বত ধর্মের জন্য **'গদ্গদ গিরা নয়ন বহ নীরা'** এই ভাব আসে, চেষ্টা করেও যখন অনুরাগী অধর্ম থেকে উদ্ধার হতে পারে না—এরূপ পরিস্থিতিতে আমি স্বরূপের রচনা করি অর্থাৎ ভগবান কেবল অনুরাগীর জন্য আবির্ভূত হন-

সো কেবল ভগতন হিত লাগী। (রামচরিতমানস, ১/১২/৫)

এই অবতার কোন কোন ভাগ্যবান্ সাধকের অন্তরে অবতীর্ণ হন। আপনি আবির্ভূত হয়ে কি করেন?–

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৮।।

অর্জুন! **'সাধুনাং পরিত্রাণায়'**- পরমসাধ্য একমাত্র পরমাত্মাই। যাঁকে লাভ করবার পর অন্যলাভের প্রয়োজন থাকে না। সেই সাধ্যে প্রবেশ সাহায্য করে যে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি দৈবী সম্পদ্গুলি, সেগুলি নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করবার জন্য এবং **'দুষ্কৃতাম্'**- যাদের মাধ্যমে দোষযুক্ত কার্যগুলি সম্পাদিত হয়, সেই কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষাদি বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ সমূলে নষ্ট করতে এবং ধর্মকে উত্তমরূপে স্থাপন করতে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

যুগের তাৎপর্য এখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে নয়; যুগধর্মের উত্থান এবং পতন মানুষের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। যুগধর্ম চিরকাল ধরে আছে। রামচরিতমানসে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে–

নিত জুগ ধর্ম হোহিঁ সব কেরে। হৃদয় রাম মায়া কে প্রেরে।।
(রামচরিতমানস, ৭/১০৩ খ/১)

যুগধর্ম সকলের হৃদয়ে সর্বদা পরিবর্তমান। অবিদ্যা থেকে নয়, বরং বিদ্যা থেকে, রামমায়ার প্রেরণা থেকেই হৃদয়ের হয়। রামমায়াকেই প্রস্তুত শ্লোকে আত্মমায়া বলা হয়েছে। হৃদয়ে রামের স্থিতি প্রদানকারী, সেই বিদ্যা রামদ্বারাই প্রেরিত। তাহলে এখন কি করে জানা যাবে যে, কখন কোন্ যুগ কাজ করছে? তা' **'সুদ্ধ সত্ত্ব সমতা বিগ্যানা। কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা।।' (মানস, ৭/১০৩ খ/২)** যখন হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ কার্যরত হয়, রাজস এবং তামস দুটি গুণই শান্ত হয়ে যায়, বৈষম্য শেষ হয়ে

যায়, যিনি দ্বেষশূণ্য, বিজ্ঞানময় হয়ে যান অর্থাৎ ইষ্ট নির্দেশ গ্রহণ এবং তার উপর দৃঢ় থাকবার ক্ষমতা অর্জন করে নেন, মনে প্রসন্নতার সঞ্চার হয়, এরূপ যোগ্যতা লাভ হলে তখন সত্যযুগে প্রবেশ করেন। এই ভাবেই অন্যদুটি যুগেরও বর্ণনা করা হয়েছে- **তামস বহুত রজোগুণ থোরা। কলি প্রভাব বিরোধ চহুঁ ওরা।। (রামচরিতমানস, ৭/১০৩ খ/৫)** তামসিক গুণ পরিপূর্ণ, কিছু রজোগুণ মিশ্রিত, চারিদিকে শত্রুভাব এবং বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির হৃদয় কলিযুগীয় জানতে হবে। যখন তমোগুণ সক্রিয় হয়, তখন মানুষের মধ্যে আলস্য, নিদ্রা এবং প্রমাদের বাহুল্য দেখা যায়। তমোগুণী ব্যক্তি কর্তব্য জেনেও তাতে প্রবৃত্ত হতে পারে না, নিষিদ্ধ কর্ম জানার পরও তা' থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। এইভাবে যুগধর্মের উত্থান এবং পতন মানুষের আন্তরিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কোন মহাপুরুষ এই যোগ্যতাগুলিকেই চারটা যুগ বলেছেন, কেউ এই চারযুগকেই চারবর্ণ বলে থাকেন, কেউ এগুলিকেই অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট সাধকের চারটি শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করেন। প্রত্যেক যুগে ইষ্ট সহায়করূপে সঙ্গে থাকেন। হ্যাঁ, উচ্চশ্রেণীতে অনুকূল সাহায্য বেশী পাওয়া যায় এবং নিম্নযুগে সহযোগ ক্ষীণ প্রতীত হয়।

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সাধ্যবস্তু প্রদান করে যে বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদিকে নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করবার জন্য এবং দুষণের কারক কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করবার জন্য এবং পরমধর্ম পরমাত্মাতে অচল রাখবার জন্য আমি যুগে যুগে অর্থাৎ প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক শ্রেণীতে আবির্ভূত হই; কিন্তু হৃদয়ে গ্লানি উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ ইষ্ট সম্মতি না দেন, ততক্ষণ আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, কোন-কোন বিকার শান্ত হয়েছে, কোন্-কোন্টা এখনও বাকী? প্রত্যেক শ্রেণীর যোগ্যতার সঙ্গে ইষ্ট থাকেন। অনুরাগীর হৃদয়ে তিনি প্রকট হন। ভগবান প্রকট হলে, সকলেই নিশ্চয় দর্শন করবে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন না–

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন।। ৯।।

অর্জুন! আমার ঐ জন্ম অর্থাৎ গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপের রচনা এবং আমার কর্ম অর্থাৎ দুষ্কর্মগুলির কারণ যেগুলি সেই কারণগুলির নাশ, যে ক্ষমতাগুলির মাধ্যমে

সাধ্য বস্তু লাভ হয় সেগুলির নির্দোষ সঞ্চার, ধর্মের স্থিরতা— এই কর্ম এবং জন্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক, লৌকিক নয়। এই চর্মচক্ষুর দ্বারা তা দেখা সম্ভব নয়। মন এবং বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করা দূরূহ। এত গূঢ় যখন, তখন তাঁকে দর্শন করেন কারা? কেবল '**যো বেত্তি তত্ত্বতঃ**'- কেবল তত্ত্বদর্শীগণ আমার এই জন্ম এবং কর্ম দেখতে সক্ষম হন। আমাকে সাক্ষাৎ করে, তাঁরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কারণ আমাকে লাভ করেন।

যখন তত্ত্বদর্শীই ভগবানের জন্ম এবং কার্য বুঝতে পারেন, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অবতারপুরুষ দেখবার জন্য কেন ভীড় করে যে কোথাও অবতার অবতীর্ণ হবেন তখন দর্শন করব? আপনি কি তত্ত্বদর্শী? আজও বহু ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষত মহাত্মা বেশে নিজেকে অবতারপুরুষ বলে প্রচার করেন, কিম্বা তাদের দালালরা প্রচার করে থাকে। ভীড় উপচে পড়ে অবতারপুরুষ দেখার জন্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কেবল তত্ত্বদর্শীই প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্বদর্শী কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৎ-অসৎ এর নির্ণয় করে বলেছেন যে, অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সৎএর তিনকালে অভাব নেই। তাহলে কি শুধু আপনিই এরূপ বলেন? তিনি বললেন— "না, তত্ত্বদর্শীগণ এটা অনুভব করেছেন।" কোন ভাষাবিদ্ বা সমৃদ্ধিশালী কেউ দেখেননি। পুনরায় এখানে জোর দিলেন যে, আমি আবির্ভূত হই, কিন্তু শুধু তত্ত্বদর্শী প্রত্যক্ষ করেন। এখানে তত্ত্বদর্শী একটা প্রশ্ন। পাঁচ অথবা পঁচিশটি তত্ত্ব নয়। সংখ্যা-গণনা করতে পারলেই তত্ত্বদর্শী হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন যে, আত্মাই পরমতত্ত্ব। আত্মা পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাত্মা হয়। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তিনিই এই আবির্ভাব অনুভব করতে পারেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, অবতার উৎকৃষ্ট অনুরাগীর হৃদয়েই আবির্ভূত হন। আরম্ভে সাধকের অনুভবে তা ধরা পড়ে না, সাধক বুঝতে পারেন না তাঁকে সঙ্কেত কে দেন? কে পথ দেখান? কিন্তু পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দর্শনের পরই তিনি দেখতে ও বুঝতে পারেন এবং দেহত্যাগের পর তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, আমার জন্ম দিব্য, এই জন্ম যিনি প্রত্যক্ষ করেন তিনি আমাকে লাভ করেন। কিন্তু লোকে তাঁর মূর্তি তৈরী করে, পূজা করে, আকাশে কোথাও তাঁর নিবাসস্থান আছে বলে কল্পনা করে থাকে। এ সমস্তের অস্তিত্বই নেই।

সেই মহাপুরুষের বলবার অর্থ এই যে, যদি আপনি নির্ধারিত কর্ম করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপনিও দিব্য। "আপনি যে স্থিতি অবস্থা লাভ করবেন, আমি সেই অবস্থা লাভ করেছি। আপনি যার সম্ভাবনা করেন, তা আমি এবং আপনার ভবিষ্যৎও আমি।" যখন আপনি পূর্ণতা লাভ করবেন, তখন আপনিও সেই অবস্থা লাভ করবেন, যে অবস্থাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আপনারও হতে পারে। অবতার বাইরে প্রকট হন না। হ্যাঁ, হৃদয় অনুরাগে পূর্ণ হলে আপনার অন্তরেও অবতারের আবির্ভাব সম্ভব। আপনার অন্তরে সেই অনুভূতি সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রোৎসাহিত করলেন যে, বহু ব্যক্তি আমার মতানুসারে চলে, আমার স্বরূপলাভ করেছেন–

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ১০।।

রাগ ও বিরাগ, উভয়ের অতীত বীতরাগ এবং সেইরূপ ভয়-অভয়, ক্রোধ-অক্রোধ, উভয়ের অতীত, অনন্যভাবে অর্থাৎ নিরহঙ্কার হয়ে আমার শরণাগত অনেক মানুষ জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপলাভ করেছেন। তবে কি আগে এরূপ বিধান ছিল না, এখন হয়েছে? না তা নয়, এই বিধান সর্বদা ছিল। বহু পুরুষ এই প্রকার আমার স্বরূপলাভ করেছেন। কি প্রকার? যাঁর যাঁর হৃদয় অধর্মের বৃদ্ধি দেখে পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য গ্লানিতে ভরে ওঠে, সেই অবস্থায় আমি নিজ স্বরূপের রচনা করি। তাঁরা আমারই স্বরূপ লাভ করেন। যাকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বদর্শন বলেছিলেন, এখানে তাকেই 'জ্ঞান' বলছেন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে বলে। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁকে জানাই জ্ঞান। এরূপ জানেন যিনি, তিনি জ্ঞানী এবং তিনি আমার স্বরূপলাভ করেন। এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন তিনি যোগ্যতার আধারে, ভজনাকারীদের শ্রেণী-বিভাগ করছেন–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ১১।।

অর্জুন! যিনি যতটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁকে সেই ভাবেই ভজনা করি, ততটুকুই সহযোগিতা করি। সাধকের শ্রদ্ধাই কৃপারূপে তাঁর

উপর বর্ষিত হয়। এই রহস্য উপলব্ধি করে জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে আমার মতানুযায়ী কর্মেরত থাকেন। আমি যেমন আচরণ করি, আমার প্রিয়ভক্তগণও সেই আচরণ করেন। আমি যা করাই, তাই তাঁরা করেন।

ভগবান কিরূপে ভজনা করেন? তিনি রথীর দায়িত্ব নিয়ে নেন, সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন, এটাই তাঁর ভজনা। কলুষসৃষ্টির কারণ নাশ করবার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকেন। যে-যে সদ্‌গুণের সাহায্যে আমরা সত্যে অনুপ্রবেশ করতে পারি, সেই-সেই সদ্‌গুণ রক্ষা করবার জন্য তিনি এগিযে আসেন। যতক্ষণ ইষ্টদেব হৃদয় থেকে রথী না হন, এবং প্রতি পদক্ষেপে সাবধান না করেন, ততক্ষণ কোন ভজনাকারীই হাজার চোখবুজে প্রযত্ন করুন, তিনি প্রকৃতির এই দ্বন্দ্ব থেকে পার হতে পারেন না। কি করে বুঝবেন যে, তিনি কতদূর পথ এগিয়েছেন? কতটুকুই বা বাকী? ইষ্টই আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে তাকে পথ দেখান যে, তুমি এখানে এইভাবে কর, এইভাবে চল। এইভাবে প্রকৃতির বাধা বিঘ্ন সরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে দিয়ে স্বরূপে প্রবেশ দিয়ে দেন। ভজন সাধকই করেন, কিন্তু তিনি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হন, সেটা ইষ্টের দান। এইরূপ জেনে সকলেই সর্বতোভাবে আমার অনুসরণ করেন। তাঁরা কিরূপ আচরণ করেন?—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।। ১২।।

সেই পুরুষ এই দেহে কর্মে সাফল্য কামনা করে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। সেই কর্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ বললেন— “অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর।” নির্ধারিত কর্ম কি? যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যজ্ঞ কি? সাধনার বিধি-বিশেষ; যাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) আহুতি, ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবাহকে সংযমাগ্নিতে হোম করা হয়। যার পরিণাম পরমাত্মা। কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল আরাধনা, যার স্বরূপ বর্তমান অধ্যায়েই পরে স্পষ্ট হবে। এই আরাধনার পরিণাম কি? ‘**সংসিদ্ধিম্**’- পরমসিদ্ধি পরমাত্মা, ‘**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**’- শাশ্বত ব্রহ্মে প্রবেশ, পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন-আমার কথামত চলেন যাঁরা, তাঁরা এই মনুষ্যলোকে কর্মের পরিণাম পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির জন্য অন্যান্য দেবতাকে পূজা করেন অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ বলবতী করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তুমি দেবতাদের বৃদ্ধি কর, দৈবী সম্পদ্ বলবতী কর। যেমন যেমন হৃদয়-রাজ্যে দৈবী সম্পদ্ উন্নত হবে, তেমন তেমন তোমার উন্নতি হবে। এইভাবে পরস্পরকে উন্নত করে পরমশ্রেয় লাভ কর। শেষপর্যন্ত উন্নতি করে যাওয়া এই অন্তঃক্রিয়া। এরই উপর জোর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার আনুকূল্যে যে মনুষ্য কর্মে সিদ্ধি প্রার্থনা করেন, আচরণ করেন দৈবী সম্পদ্ দৃঢ় করেন, যারদ্বারা সেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি শীঘ্রই লাভ হয়। তিনি অসফল হন না, সফলই হন। শীঘ্রের তাৎপর্য? কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কি এই পরমসিদ্ধি লাভ হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—না, এই সোপানে ওঠার বিধান ক্রমে ক্রমে। কেউ লাফিয়ে ভাবাতীত ধ্যানে পৌঁছে যাবে, এমন চমৎকার হয় না। এই প্রসঙ্গে দেখুন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।। ১৩।।

অর্জুন! ‘**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**’- চার বর্ণের রচনা আমি করেছি। তাহলে কি মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- না, ‘**গুণকর্মবিভাগশঃ**’- গুণের আধারে কর্মকে চারভাগে বিভাগ করেছি। গুণ এখানে মানদণ্ড। তামসিক গুণ সক্রিয় থাকলে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়ার স্বভাব, অকর্তব্য জেনেও তার থেকে নিবৃত্ত হতে অক্ষম হবে। এরূপ অবস্থাতে সাধন আরম্ভ হবেই বা কি করে? আপনি এই কর্মের জন্য যদি প্রযত্নশীল হতে চান, ঘন্টা দুই-তিন আরাধনাতেও বসেন, তাহলেও দশ মিনিটের জন্যও কিন্তু একাগ্রচিত্ত হতে পারবেন না। দেহটাকে অবশ্যই বসিয়ে রাখবেন; কিন্তু যে মনকে স্থির হওয়া উচিত, বায়ু তরঙ্গে তা বিক্ষিপ্ত থাকে, কুতর্কের জালে জড়িয়ে থাকে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছেয়ে আসে, তাহলে আপনি বসেন কেন? সময় নষ্ট করেন কেন? এরূপ অবস্থাতে শুধু ‘**পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।**’, যিনি অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত, অবিনাশী তত্ত্বে স্থিত, তাঁর এবং এই পথে অগ্রসর নিজের থেকে উন্নত সাধকের সেবা করুন। এই সেবাদ্বারা দূষিত সংস্কার শান্ত হবে এবং যে সংস্কার এই সাধনায় এগিয়ে দেবে, তা সবল হতে শুরু করবে।

তামসিক গুণ ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এলে রাজসিক গুণের প্রাধান্য ও সাত্ত্বিক গুণের স্বল্প সঞ্চারের সঙ্গে সাধকের ক্ষমতা বৈশ্য শ্রেণীর হয়। সেই সময় ঐ সাধক

ইন্দ্রিয়সংযম এবং আত্মিক সম্পত্তির সংগ্রহ স্বভাবতঃ করে যাবেন। কর্মে তৎপর ঐ সাধকের মধ্যে এইভাবে একদিন সাত্ত্বিকগুণের বাহুল্য ঘটবে, রাজসিক গুণ হ্রাস হয়ে আসবে, তামসিক গুণ শান্ত হয়ে যাবে। ঐ সময় সাধক ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করবেন। তখন শৌর্য, কর্মে প্রবৃত্ত থাকবার ক্ষমতা, পশ্চাৎপদ না হওয়ার মনোভাব, প্রত্যেক ভাবের উপর প্রভুত্ব, প্রকৃতির গুণত্রয় ছেদন করবার ক্ষমতা তাঁর স্বভাবের মধ্যে দেখা দেবে। ঐ কর্ম আরও সূক্ষ্ম হলে, সাত্ত্বিক গুণ কার্যরত থাকলে মনে শান্তভাব, ইন্দ্রিয়গুলির দমন, একাগ্রতা, সরলতা, ধ্যান, সমাধি, ঈশ্বরীয় নির্দেশ, আস্তিকতা ইত্যাদি ব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে যে স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলি, সেগুলির বিকাশ হয়। তখন ঐ সাধক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হন। এটা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্মের নিম্নতম সীমা। যখন ঐ সাধক ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, ঐ অন্তিম সীমায় তিনি না ব্রাহ্মণ হন না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য না শূদ্র; কিন্তু অন্যের মার্গদর্শনের সময় তিনিই ব্রাহ্মণ। কর্ম একটাই—নিয়ত কর্ম, আরাধনা। অবস্থাভেদে এই কর্মকেই উঁচু-নীচু চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে। কে বিভাগ করেছেন? যোগেশ্বর বিভাগ করেছেন, অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ বিভাগ করেছেন। সেই অবিনাশী কর্তা আমাকে তুমি অকর্তা বলেই জানবে। কেন?—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। ১৪।।

কারণ কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই। কর্মফল কি? শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে, যারদ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়ার নাম কর্ম এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে পরিণামস্বরূপ যা লাভ হয়, সেই জ্ঞানামৃত পান করেন যিনি, তিনি শাশ্বত, সনাতন ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। কর্মের পরিণাম পরমাত্মা, এখন পরমাত্মাকে লাভ করবার ইচ্ছাও বাকী নেই, কারণ এখন তিনি এবং আমি অভিন্ন। আমি অব্যক্ত স্বরূপ, তাঁরই স্থিতিযুক্ত। এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, যার জন্য কর্মের প্রতি স্নেহ রাখব, সেইজন্য কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না এবং এই স্তর থেকে যিনি আমাকে জানেন অর্থাৎ যিনি কর্মের পরিণাম পরমাত্মাকে লাভ করেন, তিনিও কর্মে আবদ্ধ হন না। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনই সেই স্তরের জ্ঞানী মহাপুরুষ।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।। ১৫।।

অর্জুন! প্রাচীন মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জেনেই কর্ম করেছেন। কি জেনে? এই যে, যখন কর্মের পরিণাম পরমাত্মা পৃথক্ থাকেন না, কর্মের পরিণাম পরমাত্মার স্পৃহা সমাপ্ত হলে, ঐ পুরুষ কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ স্থিতিযুক্ত, সেইজন্য তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। সেই স্তর সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে, আমরাও কর্মদ্বারা আবদ্ধ হব না। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ, এই সমস্ত স্তরের জ্ঞাতারও সেই-ই রূপ তিনিও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবান', 'মহাত্মা', 'অব্যক্ত', 'যোগেশ্বর', 'মহাযোগেশ্বর' যাই হোন না কেন, সে স্বরূপ সকলের জন্য। এই অনুভব করেই পূর্ব মুমুক্ষুপুরুষগণ, মোক্ষ ইচ্ছুক পুরুষগণ কর্ম আরম্ভ করেছিলেন। সেইজন্য অর্জুন, তুমিও এই কর্ম কর, যা পূর্বপুরুষগণ সর্বদা করে এসেছেন। এটাই কল্যাণের একমাত্র পথ।

এ পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করবার উপর জোর দিয়েছেন; কিন্তু স্পষ্ট বলেননি যে, কর্ম কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কর্মের নাম মাত্র নিয়েছেন। ও বলেছেন-এখন একেই তুমি নিষ্কাম কর্মের বিষয়ে শোন। এর বিশেষত্বের বর্ণনা করেছেন যে, এই কর্ম আমাদের জন্ম-মৃত্যুর মহাভীতি থেকে রক্ষা করে। কর্ম করবার সময় সাবধান হতে বলেছেন, কিন্তু বলছেন না কর্ম কি? তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, জ্ঞানমার্গ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে। কর্মত্যাগ করলেই কেউ জ্ঞানী হয় না এবং কর্ম আরম্ভ না করে নিষ্কর্মীও হওয়া যায় না। হঠকারিতাবশতঃ যে করে না, সে দাম্ভিক, সেইজন্য মন থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে কর্ম কর। কোন কর্ম? বললেন–নিয়ত কর্ম কর। এখন এই নিয়ত কর্ম কি? তখন বললেন– যজ্ঞের প্রক্রিয়াই নিয়ত কর্ম। এ এক নতুন জিজ্ঞাসা যে, যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্মের আচরণ করা হয়? এখানেও যজ্ঞের উৎপত্তি বিষয়ে বলেছেন, এর বিশেষত্বের বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যজ্ঞ কি? তা বললেন না। তাহলে কর্ম কি স্পষ্ট হত এখনও কর্ম কি? স্পষ্ট হয়নি। এখন বলছেন, অর্জুন! কর্ম কি? অকর্ম কি?– এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানও মোহিত; তাই তা'সুস্পষ্টভাবে জানা উচিত–

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।

তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।। ১৬।।

কর্ম কি? অকর্ম কি?– এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ পুরুষগণও মোহাচ্ছন্ন। সেই জন্য আমি সেই কর্ম কি? তা তোমাকে স্পষ্টভাবে বলব, যা জেনে তুমি **'অশুভাৎ মোক্ষ্যসে'** অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। কর্মই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই কর্মকে জানবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন–

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। ১৭।।

কর্মের ও অকর্মের স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক এবং বিকর্ম অর্থাৎ বিকল্পশূণ্য বিশেষকর্ম, যার আচরণ আপ্তপুরুষগণ করতে সমর্থ হন, তা'ও অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ কর্মের গতি দুর্ভেদ্য। কিছু লোক বিকর্মের অর্থ 'নিষিদ্ধ কর্ম', 'মনোযোগ সহকারে যে' কর্ম করা হয় ইত্যাদি মনে করেন। বস্তুতঃ এখানে 'বি' উপসর্গ বিশিষ্টতার দ্যোতক। প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের কর্ম বিকল্পশূণ্য হয়। আত্মস্থিত, আত্মতৃপ্ত, আপ্তকাম মহাপুরুষগণ কর্মে প্রবৃত্ত থাকলে না কোন লাভ হয় এবং কর্মত্যাগ করলে না কোন লোকসান হয়, তবুও অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। এরূপ কর্ম বিকল্পশূণ্য হয়, বিশুদ্ধ হয় এবং এই কর্মকেই বিকর্ম বলা হয়।

উদাহরণের জন্য গীতায় যেখানে যেখানে 'বি' উপসর্গের প্রয়োগ হয়েছে সেটা তার বিশেষত্বের দ্যোতক, নিকৃষ্টতার নয়। যেমন- **'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।' (গীতা, ৫/৭)** যিনি যোগযুক্ত, তিনি বিশেষরূপে শুদ্ধ আত্মাযুক্ত, বিশেষরূপে জয়ী অংতঃকরণযুক্ত ইত্যাদি বিশিষ্টতার দ্যোতকস্বরূপ। এই প্রকারে গীতায় মাঝে মাঝে 'বি'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে, যা বিশেষরূপে পূর্ণের দ্যোতকস্বরূপ। এইপ্রকার 'বিকর্ম'ও বিশিষ্ট কর্মের দ্যোতকস্বরূপ, যা প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যা' শুভাশুভ সংস্কারের সৃষ্টি করে না।

বিকর্ম কাকে বলে আপনি দেখলেন, বাকী রইল কর্ম এবং অকর্ম, যা পরের শ্লোকে বুঝবার চেষ্টা করুন। যদি এখানে কর্ম-অকর্মের পার্থক্য বুঝতে না পারেন, তাহলে কখনও বুঝতে পারবেন না।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।। ১৮।।

যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, কর্মের অর্থ আরাধনা অর্থাৎ আরাধনা করেও নিজেকে কর্তা বলে অনুভব করেন না, বরং গুণত্রয়ই আমাকে চিন্তনে নিযুক্ত করে, 'আমি ইষ্টদ্বারা সঞ্চালিত'- এরূপ অনুভব করেন এবং যখন এই প্রকার অকর্ম দেখার ক্ষমতা এসে যায় এবং নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে যে, ঠিক পথে কর্ম হচ্ছে। তিনিই বুদ্ধিমান, মানুষের মধ্যে তিনিই যোগী, যোগযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ কর্মের কর্তা। তাঁর কর্মে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না।

সারাংশতঃ অতএব এই আরাধনাই কর্ম। সেই কর্ম করুন এবং করবার সময় অকর্তাভাব নিয়ে করুন যে, আমি তো যন্ত্রমাত্র, করাচ্ছেন ইষ্ট এবং আমি গুণজাত অবস্থা অনুসারে চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র।— যখন অকর্ম দেখবার ক্ষমতা আসে, তখন নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখনই পরমকল্যাণের স্থিতি প্রদানকারী কর্ম করা সম্ভব। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন যে— "যতক্ষণ ইষ্ট রথী না হন, আদেশ-নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ সাধনার ঠিক-ঠিক আরম্ভ হয় না।" এর পূর্বে যা কিছু করা হয় তা কর্মে প্রবেশের প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। লাঙ্গলের সব ভার গরুর কাঁধের উপরই থাকে, তবুও খেতের চাষ চাষীর কৃতিত্ব, ঠিক এইরূপ সাধনের সব ভার সাধকের উপরই থাকে, কিন্তু বাস্তবিক সাধক ইষ্ট, যিনি সঙ্গে থেকে পথপ্রদর্শন করেন। ইষ্টের ইঙ্গিত ব্যতীত আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, আপনি কতদূর এগিয়েছেন? প্রকৃতিতে ভ্রান্ত অথবা পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকার ইষ্টের নির্দেশে যে সাধক এই আত্মিক পথে অগ্রসর হন, নিজেকে অকর্তা ভেবে নিরন্তর কর্ম করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যোগী। প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কর্ম কি সর্বদা করতে হবে অথবা কখনও সম্পূর্ণও হবে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বললেন—

শ্রীকৃষ্ণের মত অনুসারে যা' কিছু করা হয়, তা' কর্ম নয়। নির্ধারিত ক্রিয়াই কর্ম। '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**'- অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? বললেন, '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**।'- যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়াই কর্ম। তাহলে এছাড়া যা' কিছু করা হয়, সে সমস্ত কি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- '**অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**'- এই যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া ছাড়া যা' কিছু করা হয়, তা এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। '**তদর্থং কর্ম**'- অর্জুন! যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার জন্য উত্তমরূপে আচরণ কর। এবং যজ্ঞের স্বরূপ বললেন, যা হ'ল শুদ্ধরূপে আরাধনার এক বিধি-বিশেষ, যা আরাধ্যদেবপর্যন্ত পৌঁছিয়ে, তাঁতেই বিলীন করে দেয়।

এই যজ্ঞে ইন্দ্রিয়ের দমন, মনের শমন, দৈবী সম্পদ্ লাভ ইত্যাদি বলে শেষে বললেন—বহু যোগী প্রাণ এবং অপানের গতি নিরুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। এরূপ অবস্থাতে অন্তরে কোন সঙ্কল্প জাগে না, বাইরের জগতের ঘটনা মনে রেখাপাত করতে পারে না। এইরূপ স্থিতিতে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করে সেই নিরুদ্ধ চিত্তের বিলয়কালে সেই পুরুষ '**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**'- শাশ্বত, সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ পান। এই সমস্তই যজ্ঞ, যাকে কার্যরূপ দেওয়ার নাম কর্ম। কর্মের শুদ্ধরূপ 'আরাধনা', কর্মের অর্থ 'ভজন', কর্মের অর্থ যোগসাধনাকে উত্তমরূপে সম্পাদিত করা, যার বিশদ বর্ণনা বর্তমান অধ্যায়েই পরে করা হবে। এখানে কর্ম ও অকর্মে পার্থক্য করা হয়েছে, যাতে কর্ম করবার সময় তার সঠিক দিক্-নির্ধারণ হয় এবং তাতে চলা যেতে পারে।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।। ১৯।।

অর্জুন! '**যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ**'- যিনি সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া আরম্ভ করেছেন (যা পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, অকর্ম কি তা দেখবার ক্ষমতা এলে কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ সম্পূর্ণ কর্মের কর্তা হন, যাতে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না।) '**কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ**'- ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে যখন এতটা সূক্ষ্ম হয় যে বাসনা এবং মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের ঊর্ধ্বে উঠে যায় (কামনা এবং সঙ্কল্পের নিরুদ্ধ হওয়াই মনের জয়ী অবস্থা। অতএব কর্ম এই মনকে কামনা এবং সঙ্কল্প-বিকল্পের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়) সেই সময় '**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্**'- অন্তিম সঙ্কল্প শান্ত হওয়ার পর, যাঁকে জানি না, জানবার ইচ্ছুক ছিলাম, সেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ক্রিয়াত্মক পথে চলে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা 'জ্ঞান'। সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গেই '**দগ্ধকর্মাণম্**'- কর্ম সর্বদার জন্য ভস্মীভূত হয়। যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যখন তাঁকে লাভ করেছি, এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, তখন কর্ম করে কার খোঁজ করা হবে? তাঁকে জানবার পর কর্মের প্রয়োজন হয় না। এরূপ স্থিতি যাঁদের, তাঁদেরই বোধস্বরূপ মহাপুরুষগণ পণ্ডিত বলেছেন। তাঁদের জ্ঞান পূর্ণ। এরূপ স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ করেন কি? কি ভাবে অবস্থান করেন? তাঁর অবস্থিতির উপর আলোকপাত করলেন—

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ।। ২০।।

অর্জুন! সেই পুরুষ সাংসারিক আশ্রয় থেকে মুক্ত, নিত্যবস্তু পরমাত্মাতেই তৃপ্ত, কর্মের ফল পরমাত্মার আসক্তিও ত্যাগ করে (কারণ এখন পরমাত্মা অভিন্ন) উত্তমরূপে কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও কিছু করেন না।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।

যিনি দেহ এবং অন্তঃকরণ জয় করেছেন, সকল ভোগসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, এরূপ আশামুক্ত পুরুষের দেহ কর্ম করছে দেখা যায় মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কিছুই করেন না, এইজন্য তাঁর পাপ হয় না। তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেছেন, সেইজন্য তাঁকে গমনাগমন করতে হয় না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।। ২২।।

বিনা চেষ্টাতে যা কিছু লাভ হয় তাতেই সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বগুলির অতীত, '**বিমৎসরঃ**'- ঈর্ষামুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বভাবযুক্ত পুরুষ কর্ম করলেও সেই কর্মে আবদ্ধ হন না। সিদ্ধি অর্থাৎ যাঁকে লাভ করবার ছিল, তিনি যখন অভিন্ন এবং আর কখনও পৃথকও হবে না, সেইজন্য অসিদ্ধিরও ভয় নেই। এই প্রকার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবযুক্ত পুরুষ কর্ম করেও আবদ্ধ হন না। তিনি কোন কর্ম করেন? সেই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। পুনরায় একেই বলছেন—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।। ২৩।।

অর্জুন! '**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম**'- যজ্ঞের আচরণই কর্ম এবং সাক্ষাৎকারকেই জ্ঞান বলে। এই যজ্ঞের আচরণ করে সাক্ষাৎকারের পর জ্ঞানে স্থিত, সঙ্গদোষ এবং আসক্তিমুক্ত মুক্তপুরুষের সমস্ত কর্ম উত্তমরূপে বিলীন হয়। সেই কর্মের কোন পরিণাম নেই, কারণ কর্মের ফল পরমাত্মা ও তিনি এখন অভিন্ন। ফলে আর কি ফল হবে? সেইজন্য ঐ মুক্ত পুরুষগণের নিজের জন্য কর্মের প্রয়োজন হয় না। তবুও

লোকসংগ্রহের জন্য তাঁরা কর্ম করেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও তাঁরা কর্মে লিপ্ত হন না। কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না, কেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। ২৪।।

এরূপ মুক্তপুরুষের সমর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নিও 'ব্রহ্ম'ই অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ কর্তাদ্বারা যা আহুতি দেওয়া হয় তা' ব্রহ্ম। '**ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা**'- যাঁর কর্ম ব্রহ্মের স্পর্শ করে সমাধিস্থ, তাঁতে বিলীন হয়ে গেছে, এরূপ মহাপুরুষের জন্য লাভের যোগ্য ব্রহ্মই। তিনি কিছু করেন না, লোক-সংগ্রহার্থ কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন।

এ সমস্তই প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষের লক্ষণ; কিন্তু কর্মে প্রবেশ করেছেন যে প্রারম্ভিক সাধক, তিনি কোন যজ্ঞ করেন?

পূর্বের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! কর্ম কর। কোন্ কর্ম? বললেন— '**নিয়তং কুরু কর্ম**'- নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কোন্‌টি? বললেন— '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।**' (৩/৯)- অর্জুন! যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এই যজ্ঞের অতিরিক্ত যা কিছু কার্য করা হয়, তা' এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। কর্ম সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। অতএব '**তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।**'- যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার জন্য সঙ্গদোষ থেকে তফাতে অবস্থান করে উত্তমরূপে যজ্ঞের আচরণ কর। এখানে এক নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যে, সেই যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্ম সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে? তিনি কর্মের বিশেষত্বের উপর জোর দিলেন, বললেন যজ্ঞের উৎপত্তি হল কোত্থেকে? যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? বৈশিষ্টের বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যজ্ঞ কি? তা এখনও বললেন না।

এখন সেই যজ্ঞকেই এখানে স্পষ্ট করছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।। ২৫।।

আগের শ্লোকটিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মস্থিত মহাপুরুষের যজ্ঞের নিরুপণ করেছেন; কিন্তু অন্যযোগীগণ, যাঁরা এখনও সেই তত্ত্বে স্থিত হননি, ক্রিয়াতে

প্রবেশ করবেন, তাঁরা কোত্থেকে আরম্ভ করবেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, অন্যযোগীগণ **'দৈবং যজ্ঞম্'** অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে সংগ্রহ করেন, যা' করবার নির্দেশ ব্রহ্মা দিয়েছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে উন্নত কর। যেমন যেমন হৃদয়ক্ষেত্রে দৈবী সম্পদ্ অর্জন হবে, তেমন তেমন প্রগতি হবে এবং ক্রমশঃ পরস্পর উন্নতি করে পরমশ্রেয় লাভ কর। দৈবী সম্পদ্ হৃদয় ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা প্রাথমিক শ্রেণীর যোগীদের যজ্ঞ।

ঐ দৈবী সম্পদের, ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা' আছে সকলের মধ্যে, কেবল মহত্বপূর্ণ কর্তব্য মনে করে সেগুলিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, তা'তে লিপ্ত হতে হবে। এগুলিকেই ইঙ্গিত করে যোগেশ্বর বলছেন- অর্জুন! তুমি শোক করো না, কারণ তোমার মধ্যে দৈবী সম্পদের সমাবেশ হয়েছে, তুমি আমাতে নিবাস করবে, আমার শাশ্বত স্বরূপ লাভ করবে। এই দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণকর এবং এর বিপরীত আসুরী সম্পদ্ নীচ এবং অধম যোনির কারণ। আসুরী সম্পদের আহুতি দেওয়া হয়, সেই জন্য এর নাম যজ্ঞ এবং এখান থেকেই এই যজ্ঞ আরম্ভ হয়।

অন্যযোগীগণ **'ব্রহ্মাগ্নৌ'**- পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন যে, এই দেহে 'অধিযজ্ঞ' আমি। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যজ্ঞ যাতে বিলীন হয়, সেই পুরুষ আমি। শ্রীকৃষ্ণ যোগী, সদ্গুরু ছিলেন। এই প্রকার অন্যযোগীগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ সদগুরুকে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সারাংশতঃ সদ্গুরুর স্বরূপের ধ্যান করেন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।। ২৬।।

অন্যযোগীগণ শ্রোত্রাদিক (শ্রোত্র, নেত্র, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা) সকল ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আকর্ষণ করে সংযত করেন। এখানে আগুন জ্বলে না। আগুনে যেমন প্রত্যেকটি বস্তু ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ সংযম এক প্রকার আগুন, যা' ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবাহ দগ্ধ করে। আরও অন্যান্য যোগীগণ শব্দাদিক (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ সে সমস্তের অর্থ পরিবর্তন করে সাধনোপযোগী করে নেন।

সাধককে সংসারে থেকেই ভজন করতে হয়। সাংসারিক ব্যক্তিদের ভালমন্দ শব্দ সবই শোনেন। বিষয়োত্তেজক শব্দ শোনামাত্র সাধক সে সবের আশয় বৈরাগ্যে সহায়ক, বৈরাগ্যোত্তেজক ভাবে পরিবর্তিত করে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেন। যেমন একবার অর্জুন চিন্তনে রত ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁর কর্ণকুহরে সঙ্গীত লহরী প্রতিধ্বনিত হল। মাথাতুলে দেখলেন উর্বশী দাঁড়িয়ে, যে বেশ্যা ছিল। সকলেই তার রূপে মুগ্ধ ছিল, কিন্তু অর্জুন তাকে স্নেহদৃষ্টিতে মাতৃবৎ দেখলেন। এইভাবে দেখামাত্র শব্দ ও রূপে বিকৃত করে যে বিকারগুলি, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

এখানে অগ্নি ইন্দ্রিয়। অগ্নিতে যেমন যে কোন বস্তু ভস্মীভূত হয়, সেই প্রকার অর্থ পরিবর্তন করে ইষ্টের অনুকূল করে নিলে বিষয়োত্তেজক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ভস্ম হয়ে যায়, সাধকের মনে কুপ্রভাব পড়ে না। সাধক এই শব্দগুলিতে রুচি দেখান না, এগুলি গ্রহণ করেন না।

এই শ্লোকগুলিতে 'অপরে', 'অন্যে' শব্দ একজন সাধকেরই উঁচু-নীচু অবস্থা-বিশেষ, যজ্ঞকর্তার উঁচু-নীচু স্তর। 'অপর'- এর তাৎপর্য পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ নয়।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। ২৭।।

এখনপর্যন্ত যোগেশ্বর যে যজ্ঞের চর্চা করলেন, তাতে ক্রমশঃ দৈবী সম্পদ্ অর্জন করা হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের সমস্ত চেষ্টাগুলিকে সংযত করা হয়, বিষয়োত্তেজক শব্দগুলির প্রবল আঘাতের পরও, সেগুলির অর্থ পরিবর্তন করে তাদের প্রভাব এড়ানো যায়। এর থেকে উন্নত অবস্থাযুক্ত যোগীগণ ইন্দ্রিয়সমূহের সকল চেষ্টা এবং প্রাণের ব্যাপারকে সাক্ষাৎকারের পর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত পরমাত্ম-স্থিতিরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। যখন সংযমের ক্ষমতা আত্মার সঙ্গে তদ্রূপ হয়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার শান্ত হয়ে যায় সেই সময় বিষয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করে যে ধারা এবং ইষ্টে প্রবৃত্তি প্রদান করে যে ধারা, দুটি ধারাই আত্মসাৎ হয়ে যায়। পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ হয়। যজ্ঞের পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়। এই হ'ল যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা যে পরমাত্মা লাভের ইচ্ছা ছিল, যখন তাঁতেই স্থিতিলাভ হয়েছে, তখন বাকী রইল কি? পুনরায় যোগেশ্বর যজ্ঞের বিশদ বর্ণনা করলেন—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।। ২৮।।

কেউ কেউ দ্রব্যযজ্ঞ করেন অর্থাৎ আত্মপথে মহাপুরুষের সেবায় পত্র-পুষ্প অর্পণ করেন। তাঁরা সমর্পণের সঙ্গে মহাপুরুষের সেবাতে দ্রব্যদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন যে, ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প, ফল, জল যা কিছু আমাকে অর্পণ করা হয়, তা আমি গ্রহণ করি এবং তারজন্য পরমকল্যাণ সৃজন করি। এটাও যজ্ঞ। প্রত্যেক আত্মার সেবা, ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আত্মপথে নিয়ে আসা দ্রব্যযজ্ঞ। কারণ দ্রব্যযজ্ঞ প্রাকৃতিক সংস্কার ভস্মীভূত করতে সমর্থ।

এই প্রকার অন্য কেউ কেউ '**তপোযজ্ঞাঃ**'- স্বধর্ম পালনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করেন অর্থাৎ স্বভাবজাত ক্ষমতা অনুসারে যজ্ঞের নিম্ন এবং উন্নত অবস্থাগুলির মাঝে অবস্থান করেন। এই পথে যার জ্ঞান অল্প সে প্রথম শ্রেণীর সাধক শূদ্র পরিচর্যাদ্বারা, বৈশ্য দৈবী সম্পদ্ সংগ্রহদ্বারা, ক্ষত্রিয় কাম-ক্রোধাদির উন্মুলনদ্বারা এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মে প্রবেশের যোগ্যতার স্তর থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেন। একই পরিশ্রম সকলকেই করতে হয়। বাস্তবে যজ্ঞ একটাই। অবস্থা অনুসারে উঁচু-নীচু শ্রেণী পার হতে থাকে।

'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন- "মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি ও শরীরকে লক্ষ্যের অনুরূপ সংযত করাকেই তপ বলে। এরা লক্ষ্য থেকে দূরে পালাবে, এদের সংযত করে সেই দিকেই নিযুক্ত কর।"

অনেক পুরুষ যোগযজ্ঞের আচরণ করেন। প্রকৃতিতে দিক্‌ভ্রান্ত আত্মার প্রকৃতি থেকে পর পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের নাম 'যোগ'। যোগের পরিভাষা অধ্যায় ৬/২৩-এ দ্রষ্টব্য। সামান্যতঃ দুটি বস্তুর মিলনকে যোগ বলা হয়। কাগজের সঙ্গে কলম, থালা ও টেবিল ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে, একে কি যোগ বলা যেতে পারে? না, এ সমস্ত পঞ্চভূতে নির্মিত পদার্থ। একটাই, দুটো নয়। দুই হ'ল প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতিতে স্থিত আত্মা নিজেরই শাশ্বতরূপ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করে, তখন প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়ে যায়, তাকেই যোগ বলে। অতএব অনেক পুরুষ এই মিলনে সহায়ক শম, দম ইত্যাদি নিয়মগুলির উত্তমরূপে আচরণ করেন। যোগ যজ্ঞের কর্তা এবং অহিংসাদি তীক্ষ্ম ব্রতগুলির সঙ্গে সংযুক্ত যত্নশীল পুরুষ '**স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ**'- নিজের

অধ্যয়ন, স্ব-রূপের অধ্যয়ন করেন তিনিই জ্ঞানযজ্ঞের কর্তা। এখানে যোগের অঙ্গগুলি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি) কে অহিংসাদি তীক্ষ্মব্রতগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেকেই স্বাধ্যায় করেন। বই পড়া স্বাধ্যায়ের আরম্ভিক স্তর। বিশুদ্ধ স্বাধ্যায় হল নিজের অধ্যয়ন, যার ফলে স্বরূপের উপলব্ধি হয়, যার পরিণাম জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার।

যজ্ঞের পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলছেন–

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।। ২৯।।

বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন এবং এই প্রকার কোন কোন যোগী প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন। এর থেকে সুক্ষ্ম অবস্থা হলে অন্য যোগীগণ প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতিরুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান।

যাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-অপান বলছেন, তাকেই মহাত্মা বুদ্ধ 'অনাপান' বলেছেন। একেই তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস বলেছেন। প্রাণ সেই শ্বাসকে বলে, যা আপনি গ্রহণ করেন এবং অপান সেই শ্বাসকে বলে, যা' ত্যাগ করেন। যোগীগণ অনুভব করেছেন যে, আপনি শ্বাসের সঙ্গে বাহ্য বায়ুমণ্ডলের সঙ্কল্পও গ্রহণ করেন এবং প্রশ্বাসে আন্তরিক ভাল-মন্দ চিন্তনের তরঙ্গ ত্যাগ করেন। বাহ্য কোন সঙ্কল্প গ্রহণ না করা প্রাণের আহুতি এবং অন্তরে সঙ্কল্প জাগ্রত না হতে দেওয়াকে অপানের আহুতি বলে। অন্তরে সঙ্কল্পের স্ফুরণ যেন না হয় এবং বাহ্য জগতের কোন চিন্তন অন্তরে যাতে ক্ষোভ উৎপন্ন না করতে পারে। এই প্রকার প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হলে, প্রাণের আয়াম অর্থাৎ নিরুদ্ধ হয়, একেই প্রাণায়াম বলা হয়। এই হল মনকে জয় করা। প্রাণের গতি রুদ্ধ করা এবং মনের গতি রুদ্ধ করা একই কথা।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই প্রকরণটি নিয়েছেন। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে- '**চত্বারি বাক্ পারমিতা পদানি**'- **(ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৫, অথর্ববেদ ৯/১৫/২৭)** এ বিষয়ে 'পূজ্যমহারাজজী' বলতেন-"হো ! একটা নামকেই চারটি শ্রেণীতে জপ করা হয়-যেমন বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী এবং পরা। **বৈখরী** অর্থাৎ যা' ব্যক্ত হয়, নামের উচ্চারণ এতে এমনভাবে হয় যে, জপকর্তা ছাড়াও আশে-পাশে কেউ থাকলে তিনিও শুনতে পাবেন। **মধ্যমা** অর্থাৎ মধ্যম স্বরে জপ, জপকর্তা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবেন

না। এই উচ্চারণ কণ্ঠ থেকে উদ্ভুত হয়, ধীরে ধীরে নামের একতানের সাহায্যে তন্ময়তা চলে আসে। সাধনা আরও সূক্ষ্ম হবার পর- **পশ্যন্তী** অর্থাৎ নাম দেখবার ক্ষমতা চলে আসে, এই অবস্থাতে আর জপ করতে হয় না। নাম শ্বাস-এ নিরন্তর হতে থাকে। এইস্তরে মনকে দ্রষ্টারূপে স্থির করে দেখতে হয় যে, শ্বাস কি বলতে চাইছে? কখন গ্রহণ করা হয়? কখন ত্যাগ করা হয়? শ্বাস কি বলে? মহাপুরুষগণ বলেন এই শ্বাস 'নাম' ছাড়া কিছুই বলে না। এই স্তরে সাধক নাম-জপ করেন না, কেবল উচ্চারিত ধ্বনি শোনেন, শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সেইজন্য এই স্তরকে 'পশ্যন্তী' বলে।

'পশ্যন্তী' স্তরে মনকে দ্রষ্টারূপ লক্ষ্য রাখতে হয়; কিন্তু সাধন আরও উন্নত হলে শোনারও প্রয়োজন হয় না। জপ আরম্ভ করলে স্বতঃই শোনা যায়। **'জপৈ ন জপাবৈ, অপনৈ সে আবৈ।**'- স্বয়ং জপ করবার দরকার হয় না, না মনকেই বাধ্য করা হয়, কিন্তু জপ অনবরত হতে থাকে, একেই অজপা বলে। এমন নয় যে জপ আরম্ভ না করেই অজপা স্থিতিলাভ হয়। যদি কেউ জপ আরম্ভই করেনি, তাহলে তার কাছে অজপা বলে কিছু থাকে না। অজপার অর্থ এই যে, জপ না করা সত্ত্বেও জপ অনবরত হতে থাকে। একবার শ্বাসে জপ আরম্ভ করলেই, তা' প্রবাহিত হয় এবং নিরন্তর হয়। এই স্বাভাবিক জপকে বলে **অজপা** এবং এই হল 'পরাবাণী'র জপ। এই জপ প্রকৃতির ঊর্ধ্বের তত্ত্ব পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে। এর পর বাণীতে আর কোন পরিবর্তন হয় না। পরম-এর দিগ্‌দর্শন করে তাতেই বিলীন হয়ে যায়, সেইজন্য একে 'পরা' বলা হয়।

প্রস্তুত শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখতে বললেন, যদিও আগামী অধ্যায়ে (৮/১৩) তিনি ওঁ জপের উপর জোর দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধও 'অনাপান সতী'তে শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ-অপান)- এরই চর্চা করেছেন। তাহলে সেই মহাপুরুষ বলতে কি চাইছেন? বস্তুতঃ শুরুতে বৈখরী, তার থেকে মধ্যমাতে প্রবেশ এবং এর থেকে উন্নত হলে জপের পশ্যন্তী অবস্থাতে শ্বাস ধরা পড়ে। এই সময় জপ শ্বাসে অনবরত হতে থাকে, সেইজন্য জপ করবার প্রয়োজন হয় না, তখন কেবল শ্বাসকে লক্ষ্য করে যেতে হয়। সেই জন্য প্রাণ-অপান শুধু বললেন, 'নাম জপ কর'- এরূপ বলেননি, কারণ বলবার প্রয়োজন নেই। যদি বলেন তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে নিম্ন শ্রেণীগুলিতে ঘোরা ফেরা করতে থাকবে। মহাত্মা বুদ্ধ, 'গুরুদেব

ভগবান্’ এবং প্রত্যেক মহাপুরুষ যাঁরা এই পথ দিয়ে গমন করেছেন, সকলেই একই কথা বলেছেন। বৈখরী এবং মধ্যমা নামজপের প্রবেশ দ্বারমাত্র। পশ্যন্তী স্তর থেকেই নামে প্রবেশ হয়। পরা শ্রেণীতে নাম অনবরত হতে থাকে, জপ বন্ধ হয় না।

এই মন শ্বাসের সঙ্গে জড়িত। যখন শ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখা হয়, শ্বাসে নাম নিরন্তর হতে থাকে, অন্তরে সঙ্কল্প উদয় হয় না এবং বাহ্য বায়ু মণ্ডলের সঙ্কল্প অন্তরে প্রবেশ করে না, এটাই মনজয়ের অবস্থা। এরই সঙ্গে যজ্ঞের পরিণাম দেখা যায়।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।। ৩০।।

অন্য যাঁরা নিয়মিত আহার করেন, তাঁরা প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন। ‘পূজ্য মহারাজজী’ বলতেন, “যোগীর আহারে নিয়ন্ত্রণ, আসন দৃঢ় এবং নিদ্রাতে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত।” আহার-বিহারের উপর নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। এরূপ বহু যোগী প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণকেই লক্ষ্য করেন, প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখেন না। শ্বাস গ্রহণের সময় ওঁ শোনেন, পুনরায় শ্বাস গ্রহণের সময় ‘ওঁ’ শোনেন। এই প্রকার যজ্ঞদ্বারা যাঁদের সমুদয় পাপ নষ্ট হয়েছে, সেই সকল পুরুষ যজ্ঞের জ্ঞাতা। এই নিদিষ্ট বিধিগুলির মধ্যে যে কোন একটি বিধির আচরণ করলেও তারার সকলেই যজ্ঞের জ্ঞাতা। এখন যজ্ঞের পরিণাম বলছেন–

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।। ৩১।।

কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! ‘**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো**’- যজ্ঞ যা’ সৃষ্টি করে, শেষে যা’ প্রদান করে, তা হল অমৃত। তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জ্ঞান। সেই জ্ঞানামৃত যিনি পান করেন অর্থাৎ প্রাপ্তকর্তা যোগীগণ ‘**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**’- শাশ্বত, সনাতন পরমব্রহ্মকে লাভ করেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন পরব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করলে কি কোন আপত্তি আছে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞরহিত পুরুষ পুনরায় এই মনুষ্যলোক অর্থাৎ মানবদেহ লাভ করে না, তাহলে অন্যলোকে কি সুখ পাওয়া যাবে? তার জন্য তির্যক্ যোনিসকল সুরক্ষিত, এর বেশী কিছুই নয়। অতএব যজ্ঞ করা নিতান্ত আবশ্যক। যজ্ঞ মানুষ মাত্রের জন্য।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজান্বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।। ৩২।।

এই প্রকার উপর্যুক্ত বহুবিধ যজ্ঞ বেদবাণীতে বিস্তারিত ও ব্রহ্মমুখে ব্যাখাত হয়েছে। প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষগণের দেহ পরব্রহ্ম ধারণ করেন। ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন অবস্থাযুক্ত ঐ মহাত্মাগণের বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়ে যায়। তাঁদের মাধ্যমে ব্রহ্মই কথা বলেন। তাঁদের বাণীতে এই যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সমস্ত যজ্ঞকে তুমি '**কর্মজান্ বিদ্ধি**'- কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে। এই কথা পূর্বেও বলেছেন, '**যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ' (৩/১৪)**। সেই সমস্ত এইভাবে ক্রিয়া চলে জানবার পর (এখানে বললেন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যাঁদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরাই যজ্ঞের যথার্থ জ্ঞাতা) অর্জুন! তুমি '**বিমোক্ষ্যসে**'- সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে যোগেশ্বর কর্ম কি, তা' স্পষ্ট করেছেন। সেই ক্রিয়াই কর্ম, যার আচরণ করলে উপর্যুক্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

এখন যদি দৈবী সম্পদের অর্জন, সদ্গুরুর ধ্যান, ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, নিঃশ্বাসকে (প্রাণকে) প্রশ্বাসে আহুতি, প্রশ্বাসকে (অপানকে) নিঃশ্বাসে আহুতি, প্রাণ-অপানের গতিরোধ, এই সমস্ত কর্ম, কৃষিকর্মে, ব্যবসা-চাকুরী অথবা রাজনীতিতে সম্ভব হয়, তাহলে আপনি করুন। যজ্ঞ এরূপ ক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পরব্রহ্মে প্রবেশ সম্ভব। বাহ্য কোন কার্যদ্বারা পরব্রহ্ম লাভ অসম্ভব।

বস্তুতঃ এ সমস্তই যজ্ঞ চিন্তনের অন্তঃক্রিয়া, আরাধনার চিত্রণ, যাতে আরাধ্যদেব বিদিত হন। যজ্ঞ আরাধ্যদেব পর্যন্ত পৌঁছানোর নির্ধারিত প্রক্রিয়া-বিশেষ। এই যজ্ঞ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ-অপান), প্রাণায়াম ইত্যাদি যে ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই কার্য-প্রণালীর নাম 'কর্ম'। কর্মের শুদ্ধ অর্থ 'আরাধনা', 'চিন্তন'।

প্রায়ই লোকে বলে যে, সংসারে যা' কিছু করা হয়, সে সমস্তই কর্ম। কামনাশূণ্য হয়ে যা' কিছু করা হবে, তাই নিষ্কাম কর্ম হবে। কেউ বলে বেশী লাভ করবার জন্য বিদেশী বস্ত্রবিক্রি করলে আপনি সকামী। দেশ-সেবার জন্য স্বদেশী বস্ত্রবিক্রি করলে আপনি নিষ্কাম কর্মযোগী। নিষ্ঠাপূর্বক চাকুরী করলে, লাভ-লোকসানের চিন্তা-ত্যাগ করে ব্যবসা করলে আপনি নিষ্কাম কর্মযোগী। জয়-পরাজয়ের চিন্তা না করে যুদ্ধ

করলে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে নিষ্কর্মী, মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায়? বস্তুতঃ এমন কিছুই হয় না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই নিষ্কাম কর্মে নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই- **‘ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।’** অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যজ্ঞ কি? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আহুতি, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, যজ্ঞস্বরূপ মহাপুরুষের ধ্যান, প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিরোধ। এই হ’ল মনকে জয় করা। মনের প্রসারই এই জগৎ। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে, **‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।’ (৫/১৯)**- যাঁদের মন সমভাবে স্থিত, সেই পুরুষগণ চরাচর জগৎ এখানেই জয় করতে সক্ষম। মনের সমতা এবং জগৎ জয় উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ? যদি জগৎ জয় করা হ’ল, তাহলে বাধা কোথায়? তখন বলছেন, সেই ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, যদি মনও নির্দোষ এবং সমভাব যুক্ত হয়, তাহলে তখন মন ব্রহ্মে স্থিত হয়।

সারাংশতঃ মনের প্রসারই জগৎ। চরাচর জগৎ আহুতির সামগ্রী রূপে বিদ্যমান। মন সর্বথা নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিরোধ হয়ে যায়। মন নিরুদ্ধ হলেই যজ্ঞের পরিণাম বেরিয়ে আসে। যজ্ঞ যে জ্ঞানামৃত সৃষ্টি করে, সেই জ্ঞানামৃত যাঁরা পান করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এই সকল যজ্ঞের বিবরণ ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষের বাণীদ্বারা বিবৃত হয়েছে। এমন নয় যে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সাধকগণ পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ করেন, বরং এই সমস্ত যজ্ঞই সাধকের উঁচু-নীচু অবস্থামাত্র। এই যজ্ঞ যে উপায়ে অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ার নাম কর্ম। গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও সাংসারিক কার্য-ব্যবসার সমর্থন করে না।

প্রায়ই যজ্ঞ বলতে লোকে এক যজ্ঞবেদী তৈরী করে তিল, যব ইত্যাদি নিয়ে ‘স্বাহা’ বলে হোম করতে শুরু করেন। কিন্তু এটা ফাঁকিবাজি। দ্রব্যযজ্ঞ অন্য, যা শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবারই বলেছেন। পশুবলি, বস্তু-দাহ ইত্যাদির সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩।।

অর্জুন! সাংসারিক দ্রব্যগুলি দ্বারা যে যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, তার থেকে জ্ঞানযজ্ঞ [যার পরিণাম জ্ঞান (সাক্ষাৎকার), যজ্ঞ যার সৃষ্টি করে, সেই অমৃত তত্ত্বকে জানা

জ্ঞান, এরূপ যজ্ঞ।] শ্রেয়স্কর, পরমকল্যাণকর। হে পার্থ! সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানে শেষ হয়, '**পরিসমাপ্যতে**'- উত্তমরূপে সমাহিত হয়। যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান। তারপরে কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং কর্মত্যাগ করলে সেই মহাপুরুষের কোন লোকসানও হয় না।

এই প্রকার ভৌতিক দ্রব্যগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকেও যজ্ঞই বলে, কিন্তু সেই যজ্ঞের তুলনায়, যার পরিণাম সাক্ষাৎকার, সেই জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা অত্যল্প। আপনি কোটি টাকার হোম করুন, শত শত যজ্ঞবেদী তৈরী করুন, সৎপথে দ্রব্যদান করুন, সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের সেবাতে দ্রব্যদান করুন; কিন্তু তা এই জ্ঞান-যজ্ঞ অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প। বস্তুতঃ যজ্ঞ শ্বাস-প্রশ্বাসে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে) অনুষ্ঠিত হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, মন নিরোধ, এগুলিকেই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ বলেছেন। এই যজ্ঞ কিরূপে লাভ হবে? তার পদ্ধতি কোত্থেকে শেখা হবে? মন্দির, মসজিদ, গিরজাঘরে লাভ হবে অথবা পুস্তকে? তীর্থযাত্রা করলে লাভ হবে অথবা নদীতে অবগাহন করলে লাভ হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– না, লাভ করবার স্রোত একটাই তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ; যেমন–

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। ৩৪।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে উত্তমরূপে প্রণত হয়ে (প্রণাম করে, অহংকার ত্যাগ করে, শরণাগত হয়ে), উত্তমরূপে সেবা করে, নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞানলাভ কর। ঐ তত্ত্বের জ্ঞাতা জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান-সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন, সাধনা পথে এগিয়ে দেবেন। আত্মসমর্পণ করে সেবা করবার পরই এই জ্ঞান অনুশীলন করার ক্ষমতা আসে। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দিগ্‌দর্শন করেছেন। তাঁরা যজ্ঞের বিধি-বিশেষের জ্ঞাতা এবং সেই বিধি-বিশেষ আপনাকেও শেখাবেন। অন্য যজ্ঞ হলে জ্ঞানী-তত্ত্বদর্শীর কি দরকার ছিল?

অর্জুন তো ভগবানেরই সম্মুখে ছিলেন, তাহলে তাঁকে ভগবান কেন তত্ত্বদর্শীর কাছে পাঠাচ্ছেন? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। তাঁর আশয় কেবল এই ছিল যে, আজ তো অর্জুন আমার সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুরাগীদের যেন কোন ভ্রম উৎপন্ন না হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তো চলে গেছেন, এখন বর্তমানে কার শরণে যাওয়া

যাবে? সেই জন্য স্পষ্ট করলেন যে, তত্ত্বদর্শীর সান্নিধ্যে যাবে। ঐ জ্ঞানীগণ তোমাকে উপদেশ দেবেন, এবং–

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।। ৩৫।।

সেই জ্ঞানলাভ করলে তুমি আর এই প্রকার মোহমুগ্ধ হবে না। তাঁদের দেওয়া জ্ঞানের দ্বারা, সেই অনুসারে আচরণ করলে তুমি ভূতসমূহকে নিজের আত্মাতে দেখতে পাবে অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে এই আত্মার বিস্তার দেখবে। যখন সর্বত্র একই আত্মার প্রসার দেখবার ক্ষমতা আসবে, তখন তুমি আমাতে একীভূত হবে। অতএব সেই পরমাত্মাকে লাভ করবার সাধন 'তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ'। জ্ঞানের সম্বন্ধে, ধর্ম এবং শ্বাশত সত্যের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তত্ত্বদর্শীর কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করা বিধেয়।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।। ৩৬।।

সকল পাপী থেকেও যদি তুমি অধিক পাপিষ্ঠ হও, তবুও জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সকল পাপ থেকে নিঃসন্দেহে উত্তমরূপে উদ্ধার হবে। এর আশয় এই নয় যে, অধিক থেকে অধিক পাপ করে কখনও না কখনও উদ্ধার হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের বলবার অর্থ এই যে, আপনার যেন ভ্রম উৎপন্ন না হয়, যে "আমি তো খুব পাপী, আমার উদ্ধার হবে না"– এরূপ মনে করবেন না যেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ এবং আশ্বাস দিচ্ছেন যে, সকল পাপীর পাপসমূহ থেকেও বেশী পাপ করে থাকলেও, তত্ত্বদর্শীগণ দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা তুমি নিঃসন্দেহে সমুদয় পাপরাশি উত্তমরূপে পার করবে। কিরূপে–

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা।। ৩৭।।

অর্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করে। এটা জ্ঞানের প্রবেশিকা নয়, যেখান থেকে যজ্ঞে প্রবেশ পাওয়া যায় বরং এই জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পরাকাষ্ঠার চিত্রণ, যাতে

আগে বিজাতীয় কর্ম ভস্ম হয় এবং পরে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তন কর্ম তাতেই বিলয় হয়। যাঁকে লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল, যখন তাঁকে লাভ করেছি, তখন চিন্তনদ্বারা কার খোঁজ করব? এরূপ সাক্ষাৎকার যাঁর হয়েছে, সেই জ্ঞানী সমস্ত শুভাশুভ কর্মের অন্ত করে নেন। সেই সাক্ষাৎকার হবে কোথায়? বাইরে হবে অথবা ভিতরে? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। ৩৮।।

জ্ঞানের সমান পবিত্র এই সংসারে আর কিছু নেই। সেই জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) তুমি স্বয়ং (অন্য কেউ নয়) যোগের পরিপক্ক অবস্থায় (আরম্ভে নয়) নিজের আত্মার অন্তর্গত হৃদয়-ক্ষেত্রেই অনুভব করবে, বাইরে নয়। এই জ্ঞানের জন্য কোন্ যোগ্যতার প্রয়োজন? যোগেশ্বরেরই বাণীতে—

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৩৯।।

শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞানলাভ করতে পারেন। ভাবপূর্বক জিজ্ঞাসা না হলে, তো তত্ত্বদর্শীর শরণাগত হলেও জ্ঞানলাভ হয় না। কেবল শ্রদ্ধা পর্যাপ্ত নয়। শ্রদ্ধাবান্ শিথিল প্রযত্নশীল হতে পারেন। অতএব মহাপুরুষদ্বারা নির্দিষ্ট পথে তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার নিষ্ঠা আবশ্যক। এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম অনিবার্য। যে বাসনা থেকে বিরত নয়, তার জন্য সাক্ষাৎকার (জ্ঞানপ্রাপ্তি) কঠিন। কেবল শ্রদ্ধাবান্, আচরণেরত সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ করে তিনি তৎক্ষণাৎ পরমশান্তি লাভ করেন। তারপর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। এটাই অন্তিম শান্তি। এর পর কখনও তিনি আর অশান্ত হন না। এবং যেখানে শ্রদ্ধা নেই—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।। ৪০।।

অজ্ঞানী— যজ্ঞের বিধি-বিশেষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি এই পরমার্থ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। এদের মধ্যেও সংশয়যুক্ত ব্যক্তির জন্য সুখ,

পুনরায় মনুষ্যদেহ বা পরমাত্মা কিছুই নেই। অতএব তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে প্রশ্ন করে এই পথের সংশয়গুলির নিবারণ করে নেওয়া উচিত, অন্যথা তারা দুর্লভ অবস্থার পরিচয় কখনও পাবে না। তাহলে কে লাভ করেন?–

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।। ৪১।।

যাঁর কর্ম যোগদ্বারা ভগবানে সমাহিত, যাঁর সম্পূর্ণ সংশয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে নষ্ট হয়ে গেছে, পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত এরূপ পুরুষকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না। যোগের আচরণদ্বারাই কর্মগুলি শান্ত হয়। জ্ঞানলাভের পরই সংশয় নষ্ট হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। ৪২।।

সেইজন্য ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যোগে স্থিত হও এবং অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থিত নিজের এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারিদ্বারা ছেদন কর এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। সাক্ষাৎকারে বাধক সংশয় শত্রু যখন মনের ভিতরে, তখন বাইরে কেউ কারও সঙ্গে কেন যুদ্ধ করবে? বস্তুতঃ যখন আপনি চিন্তন পথে এগিয়ে যান, তখন সংশয়জাত বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি বাধারূপে উপস্থিত হয় এবং শত্রুরূপে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। সংযমের সঙ্গে যজ্ঞের বিধি-বিশেষের আচরণ করে এই বিকারগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ, যার পরিণাম পরমশান্তি। এই হল শাশ্বত বিজয়, এর পরে আর পরাজয় নেই।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এই যোগসম্বন্ধে আগে আমি সূর্যকে বলেছি, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছেন এবং রাজর্ষিগণ জেনেছেন। অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত অথবা আমি বলেছি। মহাপুরুষও অব্যক্ত স্বরূপযুক্ত। দেহটা তাঁদের জন্য নিবাসস্থান মাত্র। এরূপ মহাপুরুষের বাণীতে পরমাত্মাই কথা বলেন। এইরূপ মহাপুরুষ থেকে যোগক্রিয়া সূর্যের আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। সেই পরম প্রকাশরূপের প্রসার শ্বাসের অন্তরালে হয়, সেইজন্য সূর্যকে বলেছি।

শ্বাসে সঞ্চারিত সেগুলির সংস্কাররূপে উদয় হয়। শ্বাসে সঞ্চিত হলে, উপযুক্ত কালে সে সমস্ত সংকল্পরূপে উৎপন্ন হয়। তার মহত্ব অবগত হলেই, সেই বাক্যের প্রতি কামনা জন্মায় এবং যোগ কার্যরূপ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে এই যোগ ঋদ্ধি-সিদ্ধির রাজর্ষিত্ব শ্রেণীপর্যন্ত পৌঁছলেই নষ্ট হওয়ার স্থিতিতে এসে পৌঁছায়; কিন্তু যে প্রিয়ভক্ত, অনন্য সখা তাকে মহাপুরুষই রক্ষা করেন।

অর্জুনের জিজ্ঞাসার পর যে, আপনার জন্ম তো এখন হয়েছে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে অব্যক্ত, অবিনাশী, অজন্মা এবং সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার পর আত্মমায়া, যোগপ্রক্রিয়াদ্বারা নিজের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আবির্ভূত হই। আবির্ভূত হয়ে কি করেন? সাধ্য বস্তুগুলিকে পরিত্রাণ করবার জন্য এবং যার মাধ্যমে দূষিত, তার বিনাশ করতে এবং পরমধর্ম পরমাত্মাকে স্থির করবার জন্য আমি আরম্ভ থেকে পূর্তিকালপর্যন্ত জন্ম নিতে থাকি। আমার সেই জন্ম এবং কর্ম দিব্য, যা' কেবল তত্ত্বদর্শীই জানতে পারেন। কলিযুগের অবস্থা থেকেই ভগবানের আবির্ভাব হয় (বাস্তবিক নিষ্ঠা থাকলে তা' হয়।); কিন্তু প্রারম্ভিক সাধক, ভগবান বলছেন অথবা এমনিই কোন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, তা বুঝতে পারে না। আকাশ থেকেই বা কে কথা বলেন? 'মহারাজজী' বলতেন, যখন ভগবান কৃপা করেন, রথী হয়ে যান, তখন স্তম্ভ থেকে, বৃক্ষ থেকে, পাতা থেকে, শূণ্য থেকে, সর্বত্র থেকে কথা বলেন, সামলান। উত্থান হতে হতে যখন পরমতত্ত্ব পরমাত্মা বিদিত হন, তখন স্পর্শের সঙ্গেই তাঁকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সেইজন্য অর্জুন! আমার ঐ স্বরূপ তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন এবং আমাকে জানবার পর তাঁরা আমাতেই বিলীন হয়ে গেছেন, যে স্থান থেকে আর গমনাগমন করতে হয় না।

এই প্রকার তিনি ভগবানের আবির্ভাবের বিধি বললেন যে, সেই আবির্ভাব কোন কোন অনুরাগীর হৃদয়েই হয়, বাইরের জগতে আবির্ভাব ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। এই স্তর থেকে যিনি জানেন, তাঁকেও কর্ম আবদ্ধ করে না। এইরূপ বিবেচনা করেই মুমুক্ষু পুরুষগণ কর্মের আরম্ভ করেছিলেন। সেই সমস্ত স্তর সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি সেইরূপ হন, যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, এই উপলব্ধি নিশ্চিত হবেই। যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন। যজ্ঞের পরিণাম পরমতত্ত্ব পরমশান্তি বললেন। এই জ্ঞান

কোথায় লাভ হবে?– এই প্রসঙ্গে কোন তত্ত্বদর্শীর কাছে গিয়ে সেই বিধি-বিশেষের আচরণ করতে বলেছেন, যাতে সেই মহাপুরুষ তাঁর প্রতি অনুকূল হন।

যোগেশ্বর স্পষ্ট বলছেন যে, সেই জ্ঞান তুমি স্বয়ং আচরণ করে লাভ করবে, অন্য কেউ আচরণ করলে তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তা'ও যোগের সিদ্ধিকালে লাভ হবে, আরম্ভে নয়। সেই জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) হৃদয়-দেশে লাভ হবে, বাইরে নয়। শ্রদ্ধালু, তৎপর সংযত ইন্দ্রিয় এবং সংশয়রহিত পুরুষই এই জ্ঞানলাভ করেন। অতএব হৃদয়স্থিত সংশয়কে বৈরাগ্যের তরবারিদ্বারা ছেদন কর। এটা হৃদয়-দেশের যুদ্ধ। বাহ্য যুদ্ধের সঙ্গে গীতোক্ত যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই।

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যরূপে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন ও বলেছেন, যে প্রক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, সেই কার্যপ্রণালীর নাম কর্ম। বর্তমান অধ্যায়ে উত্তমরূপে কর্ম-সম্বন্ধে বলেছেন, অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'যজ্ঞকর্মস্পষ্টীকরণম্' নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

এইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'যজ্ঞকর্ম স্পষ্টীকরণ' নামক চতুর্থ অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'যজ্ঞকর্মস্পষ্টীকরণম্' নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'যজ্ঞকর্ম স্পষ্টীকরণ' নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।